সিরাতু আসমা'ইন নবী (সঃ)
দারস-৯
উপহারপ্রাপ্ত উপাধি

সায়্যিদু উলিদ আদাম ও সায়্যিদুন নাস

সায়্যিদু উলিদ আদাম অর্থ বনী আদমের নেতা ও সায়্যিদুন নাস অর্থ সমগ্র মানব জাতির নেতা। মানব সৃষ্টির শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আসা সকল মানুষকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবেন। তিনি সবার সামনে থাকবেন। তাই, তিনি সমগ্র মানব জাতির নেতা হিসেবে আখেরাতের ময়দানে আবির্ভূত হবেন।
হাদীসে এসেছে:
আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: কিয়ামতের দিন আমিই হব আদম আলায়হিস সালাম-এর সন্তানদের নেতা, এটা গর্ব নয়।
সহীহ: তিরমিযী ৩১৪৮, ইবনু মাজাহ ৪৩০৮, মুসনাদে আহমাদ ২৫৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব ৩৫৪৩, আবূ ইয়া'লা ৭৪৯৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৭৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১৬৫।

নেতা মূলত তিনিই হন, যিনি সমস্ত সুমহান চরিত্রে, বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া এবং আখেরাতের সকল মানুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ সুমহান চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাই তিনি সমগ্র মানুষের নেতা হবেন এটাই স্বাভাবিক। একারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ, "কিয়ামত দিবসে আমিই সকল মানুষের নেতা হব।" *-সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭১২*

হাশরের ময়দানে যখন সকল মানুষজন কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, তা থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে সুপারিশ করতে চাইবে, তখন প্রত্যেক নবীরাই নিজেদের অপারগতার কথা জানাবেন। সবশেষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ দায়িত্বটি কাঁধে তুলে নিবেন। এ কারণেই তিনি সমস্ত মানবজাতির নেতা।

সহিবু লিওয়াইল হামদ

সহিবু লিওয়াইল হামদ তথা প্রশংসার ঝান্ডার অধিকারী। হাশরের ময়দানে প্রশংসার পতাকা থাকবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে। হাদীসে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন: وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ অর্থাৎ, "আর সেদিন আমার হাতেই থাকবে 'মাকামে হামদের পতাকা', এতেও গর্ব নয়।"

সহীহ: তিরমিযী ৩১৪৮, ইবনু মাজাহ ৪৩০৮, মুসনাদে আহমাদ ২৫৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব ৩৫৪৩, আবূ ইয়া'লা ৭৪৯৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৭৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১৬৫।

সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালার সর্বোচ্চ প্রশংসা করতে পেরেছেন, এমনভাবে আর কেউ করতে পারেনি। তাই প্রশংসার পতাকাও তার হাতেই শোভা পাবে।

সহিবু মাকামে মাহমুদ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বিশেষ পুরস্কার হিসেবে যা দিয়েছেন, তা হচ্ছে মাকামে মাহমুদ।

একাধিক হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, হাশরের দিন হাশরবাসীর জন্য সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। সর্বপ্রথম শাফাআতের এই মর্যাদা অন্য কোনো নবী প্রাপ্ত হবেন না। আল্লাহ প্রদত্ত সুপারিশের এ অধিকারকেই আয়াত ও হাদীসে মাকামে মাহমুদ বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে সূরা আল ইসরার ৮০ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেনঃ

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا

"আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।"

হাদীসে এসেছে,

ইসমাইল ইবনে আবান (রাহঃ) ... ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। প্রত্যেক নবীর উম্মত নিজ নিজ নবীর অনুসরণ করবে। তারা বলবে, হে অমুক (নবী)! আপনি সুপারিশ করুন। হে অমুক (নবী)!

আপনি সুপারিশ করুন। তারা কেউ সুপারিশ করতে রাজী হবেন না। শেষ পর্যন্ত সুপারিশের দায়িত্ব নবী (ﷺ) এর উপর বর্তাবে। আর এ দিনেই আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমুদে) প্রতিষ্ঠিত করবেন।

সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৪৩৬৩আন্তর্জাতিক নং - ৪৭১৮

ওয়াসীলা

অনেকেই মাকামে মাহমুদ এবং "ওয়াসীলা"কে একই ভেবে বসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াসীলা দান করা হবে। যা আমরা তার জন্য চাই এবং আযানের দোয়াতে (آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ) প্রত্যেকেই পাঠ করি। হাদীসে এসেছে:

আলি ইবনে আইয়াশ (রাহঃ) ... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শোনার পর এ দু'আ পড়বে,

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

"হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহবানের এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযে এর প্রতিপালক, মুহাম্মাদ(ﷺ) কে ওসিলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান কর। প্রতিষ্ঠিত কর তাকে মাকামে মাহমুদে, যার ওয়াদা তুমি করেছ"। কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআত অনিবার্য হয়ে যাবে।

এ হাদিসটি হামযা ইবনে আব্দুল্লাহ তার পিতার থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৪৭১৯আন্তর্জাতিক নং - ৫০৮৬

তাহলে, এই ওয়াসীলা কী জিনিস? ওয়াসীলা হচ্ছে, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান, যা আল্লাহর আরশে আজিমের সবচেয়ে কাছে অবস্থিত। সে সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: তোমরা আমার জন্য "ওয়াসীলা"–এর প্রার্থনা করবে। সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওয়াসীলা কি?

তিনি বললেনঃ জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা। এক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ তা লাভ করবে না। আমি আশা করি যে সেই ব্যক্তি আমিই হব।

জামে' তিরমিযী, হাদিস নং- ৩৬১২

হাউজে কাউসার

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া আল্লাহর উপহার সামগ্রীর মধ্যে অন্যতম একটি উপহার হল হাউজে কাউসার। এজন্য কুরআনের একটি সূরার নামকরণই করা হয়েছে সূরা আল-কাওসার। যেখানে আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা ওয়াদা করে বলছেন:

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ

"আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করেছি।"

হাউজে কাউসার সম্পর্কে "আখেরাতের নবী ﷺ" বইয়ে, লেখক ১৫ পৃষ্ঠায় এনেছেন:
"হাশরের ময়দানের যেপাশে জান্নাতের অবস্থান সেখানে একটা নদী আছে; যার নাম আল-কাওসার। পৃথিবীর মকোকনো শব্দই এর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। কুলকুল বয়ে যাওয়া সেই নদীর পানি দুধের চেয়েও শুভ্র, মধুর চেয়েও মিষ্টি আর মেশকের চেয়েও সুগন্ধিতে ভরা! এ নদী থেকে সরাসরি দুটি ঝরনাধারা নেমে এসে সৃষ্টি করেছে হাউজে কাওসার নামের সরোবর। একটি ঝরনার মুখ স্বর্ণে মোড়া, অন্যটি রৌপ্যের। ঠিক যেখানটায় হাউজে কাওসার সেখানেই নবিজি মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য অপেক্ষা করছেন। চতুষ্কোণ সরোবরটির আয়তন এক মাসের দূরত্বের সমান। আকাশের নক্ষত্র সমপরিমাণ পানপাত্র সেখানে পদ্মের মতো ভাসছে। প্রথমে মুহাজির ও আনসারের দরিদ্র উম্মতরা নবিজি মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে এই সরোবর থেকে পান করলেন। একবার যে এর পানি পান করল অনন্তকাল সে আর পিপাসিত হবে না।"

বিভিন্ন হাদীসে কাউসার নহর ও কাউসার ঝর্ণাধারার কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন:
আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তার মধ্যে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মাথা উঠালেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন, এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ সহ সূরা আল-কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন, তোমরা জান, কাউসার কি?
আমরা বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা ও তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার রব আমাকে এটা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউযে কেয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র

সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউয থেকে হটিয়ে দিবে। আমি বলব, হে রব! সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আপনি জানেন না, আপনার পরে তারা নতুন মত ও পথ অবলম্বন করেছিল।" *[মুসলিম: ৪০০, মুসনাদে আহমাদ: ৩/১০২]*
অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইসরা ও মিরাজের রাত্রিতে আমাকে এক প্রস্রবনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো যার দু তীর ছিল মুক্তার খালি গম্বুজে পরিপূর্ণ, আমি বললাম, জিবরীল এটা কি? তিনি বললেন, এটাই কাউসার" *[বুখারী: ৪৯৬৪]*
অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাকে কাউসার দান করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে, প্রবাহিত একটি নহর। যা কোন খোদাই করা বা ফাটিয়ে বের করা হয়নি। আর তার দুই তীর মুক্তার খালি গম্বুজ। আমি তার মাটিতে আমার দু'হাত মারলাম, দেখলাম তা সুগন্ধি মিস্ক আর তার পাথরকুচি মুক্তোর।" *[মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৫২]*
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "কাউসার হচ্ছে এমন একটি নাহর যা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দান করেছেন, তার মাটি মিসকের, দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও সুমিষ্ট, এতে এমন এমন পাখি নামবে যেগুলোর ঘাড় উটের ঘাড়ের মত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো তো খুব সুস্বাদু নিশ্চয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যারা এগুলো খাবে তারা আরও কোমল মানুষ।" *[তাবারী: ৩৮১৭৪, মুসনাদে আহমাদ: ৩/২২১, তবে মুসনাদে আহমদে আবু বকরের পরিবর্তে উমরের কথা এসেছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, "তার পেয়ালাগুলোর সংখ্যা আকাশের তারকাদের সংখ্যার অনুরূপ"। [বুখারী: ৪৯৬৫]*

যে মানুষ একবার হাউজে কাউসারের পানি পান করবে সে আর কখনোই তৃষ্ণার্ত হবে না।

বিনা হিসেবে জান্নাত

"বিনা হিসেবে জান্নাত" এই উপহারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদের জন্য দেয়া হয়েছে। অন্য কোন নবীর উম্মতেরা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার উপহারটি পায়নি; শুধুমাত্র আমাদের নবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত পেয়েছেন।
এই উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং প্রত্যেক সত্তর হাজার এর অধীনে আরো সত্তর হাজার করে থাকবে।

হাদীসে এসেছে:

ইসহাক (রাহঃ) ... ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক– যারা ঝাড়ফুঁকের শরণাপন্ন হয় না, কুযাত্রা মানে না এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।
সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৬০২৮ আন্তর্জাতিক নং - ৬৪৭২

অন্য এক হাদীসে এসেছে,
ইয়াহইয়া ইবনু খালাফ আল বাহিলী ..... 'ইমরান (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তারা কারা, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেনঃ যারা ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে লাগায় না এবং (জাহিলী যুগের ন্যায়) ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা কামনা করে না বরং তারা আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াকুল করে। এ সময় উক্কাশাহ্ (রাযিঃ) ওঠে দাঁড়িয়ে বললো, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর নবী। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি আমাকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ উক্কাশাহ তোমার আগেই দলভুক্ত হয়ে গেছে।
সহীহ মুসলিম- ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪১৭, ইসলামিক সেন্টারঃ ৪৩১, হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৪১২, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২১৮

বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মদীর বিপুল পরিমাণ মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কোন হিসাব বা বিচার ছাড়াই, শুধুমাত্র ঈমানের দিকে তাকিয়ে এই উপহারটি দেয়া হবে। এই চমৎকার বিষয়টি আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য বরাদ্দ করেছেন।

সওয়াবের নবী

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ প্রত্যেক নবী ছিলেন "দায়ী ইলাল্লাহ" তথা আল্লাহর দিকে আহবান করেছেন। কোরআন হাদিসের আলোকে জানা যায়, কোন ব্যক্তি অন্যকে ভাল কাজের দিকে আহবান করলে এবং আহ্বানকৃত লোকটি সে ভালো কাজটি করলে, সমপরিমাণ সওয়াব আহ্বানকারী নিজেও পেয়ে থাকেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে এই চৌদ্দশ বছর এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার উম্মতরা যেসকল ভালো কাজ করবে, সেসকল কাজের সমান সওয়াবের ভাগীদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও হবেন।
অন্যান্যদের বেলায় ছিল তাদের কর্মের সমপরিমাণ সওয়াব। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা উম্মাতে মুহাম্মাদীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রেখেছেন। যেমন রমজানে, হজ্জের সময়, আমাদের নিয়তের উপর নির্ভর করে সহ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আমাদের সওয়াব বাড়তে থাকে। এই সওয়াব বৃদ্ধি পাওয়া অন্য কোন নবীর উম্মতের ক্ষেত্রে ছিল না। শুধুমাত্র আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে এই উম্মতকে উপহার দেয়া হয়েছে।

প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী

আখিরাতে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী হবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পুলসিরাত পার হবার পর যখন সবাই জান্নাতের আগে/সামনে অপেক্ষায় থাকবেন, তখন অনেক মানুষই আশা করবে, তাদের সামনে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হোক। কিন্তু, শুধুমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যই সর্বপ্রথম দরজা খুলে দেয়ার অনুমতি রয়েছে। মানবসকল জান্নাতের আর তর সইতে না পেরে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে জান্নাতের দরজা খুলে দেবার জন্য সুপারিশ করতে আবেদন জানাবেন। তখন তিনি ﷺ জান্নাতের নিকটে গিয়ে করাঘাত করবেন অথবা সুপারিশ করবেন। এতে ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করবেন আপনি কে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, “আমি মুহাম্মদ”। অতঃপর ফেরেশতারা বলবেন, “কেবলমাত্র আপনার জন্যই জান্নাতের দরজা উদ্বোধন করার অনুমতি রয়েছে” এবং দরজা খুলে দেবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের গরিব মুহাজিরদের নিয়ে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন।
জান্নাতে প্রবেশ করার মানুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। জান্নাতের সর্বমোট জনসংখ্যার চারভাগের তিনভাগই হবেন উম্মাতি মুহাম্মদী। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমরা এই দুনিয়াতে সর্বশেষে এসেছি, কিন্তু আখিরাতে আমরা সবকিছুতেই এগিয়ে থাকবো। হাশরের ময়দানে সবার আগে আমাদের উত্থাপন/পুনরুজ্জীবন হবে, জান্নাতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রেও আমরা আগে যাব, পুলসিরাত পার

হবার সময় আমরা আগে যাব। এভাবে আখেরাতের প্রত্যেক বিষয়েই আমরা এগিয়ে থাকবো, দুনিয়াতে পরে হয়েছি এজন্য।" *হাদীসটি সহীহ মুসলিমে এসেছে*

হাদীসে এসেছে,
আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
« آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ»
“আমি কিয়ামতের দিন জান্নাতের গেটে এসে জান্নাত খুলে দিতে বলবো। তখন দারোয়ান প্রশ্ন করবে, আপনি কে? আমি বলবো, আমি মুহাম্মাদ। তখন সে বলবে, আমাকে নির্দেশ দেওয়া আছে যে, আপনার পূর্বে আমি যেন কারো জন্য জান্নাতের দরজা খুলে না দেই”।
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭।

এ থেকে বোঝা যায়, জান্নাতে প্রথম প্রবেশ করা উম্মত হচ্ছে উম্মতে মুসলিমা, প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী নবী হচ্ছেন মুহাম্মদ ﷺ, এই সৌভাগ্যটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কেবল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই দিয়েছেন।

মুজিযার উপহার

চিরস্থায়ী মুজিযা

অন্যান্য নবী-রাসূলকে যেসব মুজিযা দেয়া হয়েছিল সেসব তাদের জীবদ্দশা পর্যন্ত সীমিত ছিল। তাদের মৃত্যুর পর সেগুলো শেষ হয়ে যায়। যেমন: মূসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি ও তার হাত শুভ্র হয়ে আলো ছড়ানো, ঈসা আলাইহিস সাল্লাম কর্তৃক কুষ্ঠ রোগীকে ও অন্ধ লোককে সুস্থ করা, দাউদ আলাইহিস সালাম কর্তৃক লোহাকে গলিয়ে ফেলা, সুলাইমান আলাইহিস সালামের বাতাসে ভ্রমণ করা সহ বিভিন্ন নবীদের মুজিযা গুলো তাদের জীবদ্দশায় পর্যন্তই সীমিত ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুজিযা গুলো আখেরাত পর্যন্ত প্রভাব

বিস্তার করবে। তার মুজিযা গুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে কুরআনুল কারীম। কিয়ামত পর্যন্ত এর চ্যালেঞ্জকে কেউ মোকাবেলা করতে পারবে না।
এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম হয়েছে صاحب المعجزة الخالدة বা চিরস্থায়ী মু'জিযার বাহক।

পূর্ণমাত্রার মুজিযা

অন্যান্য নবীদেরকে যে মু'জিযা সমূহ দেয়া হয়েছিল তার সীমিত মাত্রার ছিল, পূর্ণমাত্রার নয়। যেমন: মূসা আলাইহিস সালাম এর লাঠির আঘাতে পাথর হতে ঝরণা প্রবাহিত হয়েছিল। মূসা আলাইহিস সালাম যখন পাথরের আঘাত করে ঝরণা প্রবাহিত করলেন তখন সেখানে এমন কিছু উপাদান বিদ্যমান ছিল যা ঝরনা প্রবাহতে প্রাকৃতিকভাবেই সহায়ক। যেমন, পাথর ফেটে প্রাকৃতিকভাবেই পানি বের হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুজিযা ছিল, তার আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা বের হয়েছিল। যা মূসা আলাইহিস সাল্লাম এর লাঠির আঘাতে পাথর হতে পানি বের হবার থেকেও উচ্চমাত্রার মুজিযা।
এছাড়া, অন্যান্য নবীদের সাথে প্রায় সময় বিভিন্ন প্রাণী কথা বলেছে, কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে একটা মৃত গাছের কান্ড পর্যন্ত কথা বলেছে।
আবার, মূসা আলাইহিস সালাম এর সাথে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা কথা বলেছেন তুর পাহাড়ে, যা পৃথিবীরই একটা জায়গা। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বলার জন্য তাকে নিয়ে গেলেন সৃষ্টির শেষ সীমানা তথা সিদরাতুল মুনতাহা পেরিয়ে। সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার সাথে কথা বলেছেন।

এভাবে দেখা যায়, অন্যান্য সকল নবীদের মুজিযাগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুজিযাগুলো বেশি পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণমাত্রার ছিল।

ইসরা-মিরাজ

আল ইসরা ওয়াল মিরাজ এমন একটি উপহার যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই কেবল দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন; অন্য কোন নবীকে তা দেয়া হয়নি। মানবেতিহাসের সবথেকে উল্লেখযোগ্য ও অবিস্মরনীয় ঘটনাটি হচ্ছে আল ইসরা ওয়াল মিরাজ।

আল ইসরা ওয়াল মিরাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই কেবল দেয়ার জন্য তার নাম হয়েছে, صاحب الإسراء والمعراج তথা ইসরা এবং মিরাজের অধিকারী।

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার মাধ্যমে ইসলাম আন্তর্জাতিক জীবন বিধানে পরিণত হয়। কিন্তু এর আগে ইসরা ও মি'রাজের রাতেই এই দ্বীন আন্তর্জাগতিক দ্বীন হিসেবে পরিণত হয়। অর্থাৎ, শুধুমাত্র এই এক জগত, এক বা দুই প্রজন্ম নয় বরং শতশত প্রজন্ম পরেও ইসলাম যে মানুষের জীবন বিধান হিসেবে সর্বোত্তম আদর্শ হয়ে টিকে থাকবে, এবিষয়টি ইসরা এবং মিরাজের রাতেই নির্ধারণ হয়ে যায়। এই রাতে, সমগ্র পৃথিবীর আগামীতে অপেক্ষমান ঘটনাসমূহ, আখিরাতের ঘটনাসমূহ এবং অতীতে গত হওয়া সকল নবীদের সাথে তার ﷺ সাক্ষাত ও পরিচিতি লাভ হয় এবং সকল নবীদের নেতা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এভাবেই ইসরা এবং মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র পূর্ণতা পায়। এই ঘটনাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে عام الحزن তথা দুঃখের বছরে (এই বছরে তার স্ত্রী খাদিজা রা: এবং তার চাচা আবু তালেব মারা যান এবং তাইফ থেকেও প্রত্যাখ্যাত হয়) যখন তিনি চরমভাবে ভেঙে পড়েন, তখন তাকে পুনরায় উজ্জীবিত আশান্বিত করেন।

ওয়াজিব উপহার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কিছু জিনিস দেয়া হয়েছে যেগুলো তার জন্য ওয়াজিব কিন্তু তার উম্মতের জন্য বৈধ, মুবাহ বা মুস্তাহাব ধরনের। যেমন, মিসওয়াক করা তার উম্মতের জন্য সুন্নত কিন্তু তার জন্য ওয়াজিব ছিল। যা আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে তার প্রতি একটি উপহার।

এছাড়া, কুরবানী করা অনেক মাযহাব মতে সুন্নত(হানাফি মাজহাব মতে, সামর্থ্যবান এর জন্য ওয়াজিব), কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ওয়াজিব ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবছর নিজের পক্ষ এবং তার সমস্ত উম্মতের পক্ষ হতে কুরবানী করতেন।

আরো আছে, বিতরের নামাজ যা আমাদের জন্য সুন্নত মতান্তরে ওয়াজিব বা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ওয়াজিব ছিল।

এবং, ফজরের দুই রাকাত সুন্নত আমাদের জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ওয়াজিব ছিল।

এছাড়া, তাহাজ্জুদের নামাজও তার জন্য ওয়াজিব ছিল।

এমন কিছু উপহার আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ওয়াজিব করা হয়েছিল।

একান্ত বৈশিষ্ট্য

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একান্ত কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা কেবলমাত্র তার জন্যই বৈধ বা ওয়াজিব ছিল কিন্তু তার উম্মতের জন্য একেবারে নিষিদ্ধ ছিল।
এর মধ্যে একটি হচ্ছে, লাগাতার রোজা রাখা। الصيام بل وصل বা وصال الصوم যা হলো, লাগাতার না খেয়ে থেকে রোজা রাখা। শুধুমাত্র সেহরি এবং ইফতারে সামান্য কিছু খেয়ে আবার দিনের পর দিন রোজা রাখতেই থাকা। অথবা ইফতার না করেও লাগাতার তিন-চার দিনের রোজা রাখা। এ বৈশিষ্ট্যটিকে বলা হয় وصال الصوم ... এই ধরনের রোজা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই রাখতেন এবং আমাদেরকে তথা তাঁর উম্মতকে নিষেধ করেছেন এভাবে রোজা রাখতে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা গায়েবীভাবে জীবিকা সরবরাহ করতেন।
হাদীসে এসেছে,
ইয়াহ্ইয়া (রাহঃ) ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল পালন করা থেকে বিরত থাক (বাক্যটি তিনি) দু'বার বললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি তো সাওমে বেসাল করেন। তিনি বললেনঃ আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন। তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল করার দায়িত্ব গ্রহণ করো।
সহীহ বুখারী হাদিস নং- ১৮৪২ আন্তর্জাতিক নং - ১৯৬৬, সহীহ মুসলিম হাদিস নং- ২৪৩৮, মুওয়াত্তা মালিক হাদিস নং- ৬৫৭, আল মুওয়াত্তা-ইমাম মুহাম্মাদ রহঃ হাদিস নং- ৩৬৮

এরকম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা। এটি এই উম্মতের জন্য হারাম হলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য হালাল ছিল। সর্বোচ্চ ৯ জন পর্যন্ত তার স্ত্রী ছিল।

নিষিদ্ধ বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা কালক্রমে তার উম্মতের জন্য বৈধ হলেও তার জন্য হারাম ছিল।
তার মধ্যে একটি হচ্ছে, চোখের ইশারা করা। হাদীসে এসেছে,
উছমান ইবনে আবি শাঈবা (রাহঃ) .... সা'দ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সারহ্ উছমান ইবনে আফ্ফান (রাযিঃ)–এর নিকট আত্মগোপন করেছিল। তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর নিকট হাযির করে বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আব্দুল্লাহকে বায়'আত করান। তখন তিনি তার দিকে তিনবার তাকান এবং তাকে বায়'আত করতে অস্বীকার করেন। পরে তিনি তাকে বায়'আত করাবার পর বলেনঃ তোমাদের মাঝে এমন কোন বুদ্ধিমান লোক কি ছিল না, যে আমাকে তার নিকট হতে বায়'আত গ্রহণের হাত সরিয়ে নিতে দেখে, দাঁড়িয়ে তাকে হত্যা করে ফেলতো? তখন সাহাবীগণ বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার মনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। যদি আপনি চোখের ইশারায় এরূপ ইঙ্গিত করতেন, তবে ভাল হতো। তখন তিনি বলেনঃ কোন নবীর পক্ষে চোখ দিয়ে এ ধরণের ইঙ্গিত করা উচিত নয়।
সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং- ৪৩০৮আন্তর্জাতিক নং - ৪৩৫৯

দ্বিতীয় বিষয়টি, হচ্ছে সদকা খাওয়া বা তা থেকে গ্রহণ করা। সদকার কোন কিছু খাওয়া বা গ্রহণ করা নবীদের জন্য হারাম। কিন্তু তার ﷺ উম্মতের জন্য এগুলো গ্রহণ করা জায়েজ।

তৃতীয় হচ্ছে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধের পোশাক খুলে ফেলা নবীদের জন্য হারাম ছিল। অর্থাৎ যুদ্ধের পোশাক একবার গায়ে জড়ালে সেই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সেই পোশাক খোলার কোনো অনুমতি ছিল না নবীদের জন্য। যুদ্ধের শুরু হলে সে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা কিংবা সে যুদ্ধ স্থগিত করা কোন ভাবেই সম্ভব ছিল না। এটি হারাম ছিল।

চতুর্থ হচ্ছে, কবিতা পাঠ করা। কবিতা পাঠ করা এই উম্মতের জন্য হালাল হলেও নবীর জন্য হারাম ছিল।

সাহাবী-সাহাবীয়াদের উপাধি

সাহাবী এবং সাহাবীয়াদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মাঝে মধ্যে বিভিন্ন উপাধি দিয়েছিলেন। কখনো কখনো নিজেরা একে অপরকে বিভিন্ন উপাধি দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রায় সকল সাহাবীদের বিভিন্ন উপাধি, উপনাম, প্রসিদ্ধি, খ্যাতি ছিল। এছাড়া কিছু কিছু নাম সাহাবীদের পরবর্তী সময়ে আসা লোকেরাও তাদেরকে দিয়েছেন।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদেরও বিভিন্ন ডাকনাম ছিল। যেমন, আয়েশা রা: এর ডাকনাম ছিল "হুমায়রা।" হজরত জায়নব বিনতে খুজায়মা রা: উপনাম ছিল "উম্মুল মাসাকিন" কথা গরিব-দুঃখীদের মা। তিনি অত্যন্ত বেশি দান-সাদকা করতেন।
এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাদেরও এমন কিছু নাম ছিল। এছাড়া কখনো নিজের জামাতাদেরকেও সুন্দর সুন্দর নাম দিতেন। আবার কখনো বাচ্চাদেরকেও সুন্দর নাম দিতেন। কখনো কখনো কারো সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য নাম দিতেন। কিংবা কারো কোনো স্মরণীয় ঘটনার প্রেক্ষিতে তার নাম দিতেন।

মূলত "সাহাবী" নামটাই একটা উপাধি। ঈমানের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একনজর দেখতে পেরেছেন এবং ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিই সাহাবী। সাহাবী মানে হচ্ছে বন্ধু, সহচর, সঙ্গী, সাথী।
কিছু মানুষ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি খুব আশা করি, যদি আমি আমার ভাইদেরকে দেখতে পেতাম" তখন সাহাবীরা বললেন, "আমরা কি আপনার ভাই নই?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বললেন, "না। তোমরা তো আমার সাহাবী। আমার কিছু ভাই আছে, যারা এই পৃথিবীতে এখনো আসেনি, আখেরী জামানাতে তারা আসবে। যারা আমার ঘটনা শুনবে, না দেখেই আমার উপর ঈমান আনবে। মানুষগুলো হচ্ছে আমার ভাই।"
অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই একথাগুলো বলেছেন। যুগ যুগ ধরে উম্মতে মুহাম্মদীর যত মানুষ আসছে, তারা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাই।

সাহাবীদের কিছু নাম হল:

পদাতিক নায়ক: যুদ্ধের ময়দানে কিছু সৈন্য থাকে যারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে এবং কিছু সৈন্য পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করে। পায় হেঁটে যুদ্ধ করা মানুষগুলো সব থেকে বেশি সাহসী হয়ে থাকে। পদাতিক

সেনাবাহিনীর মধ্যে সবথেকে বেশি যোগ্য একজন সাহাবী ছিলেন, যিনি নায়ক হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি একই সাথে বর্ষা এবং তীর ছুড়তে পারতেন। এজন্য তার নাম হয়েছিল পদাতিক নায়ক। তার মূল নাম ছিল, সালামা ইবনে আকওয়া। তাকে বলা হয় بطل المشاة বা পদাতিকদের নায়ক।

হাওয়ারি - বিশেষ সঙ্গী: একজন সাহাবী ছিল حواري الرسول বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ সঙ্গী নামে পরিচিত। নাম হল, জুবাইর ইবনুল আওয়াম।
হাদীসে এসেছে,
জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুরায়শ কাফিরদের খবর আমাদের নিকট কে এনে দিতে পারবে? যুবায়র (রাঃ) বললেন, আমি। তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, কুরায়শদের খবর আমাদের নিকট কে এনে দিতে পারবে? তখনও যুবায়র (রাঃ) বললেন, আমি। তিনি পুনরায় বললেন, কুরায়শদের সংবাদ আমাদের নিকট কে এনে দিতে পারবে? এবারও যুবায়র (রাঃ) বললেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) ছিল। আমার হাওয়ারী হল যুবায়র।
(আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৮০৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩৮১০)

এভাবে তার নাম হলো حواري الرسول ...

ফেরেশতা সদৃশ: ইমরান ইবনুল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ফেরেশতা সদৃশ বলা হত। এর কারণ হচ্ছে, তার সাথে ফেরেশতারা সবসময় মুসাফাহা করতেন। ফেরেশতারা তার সাথে এত বেশি মুসাফাহা করতেন যে, তার হাতে ছাপ পড়ে গিয়েছিল। এজন্য অন্যান্য সাহাবীরা তাকেই ফেরেশতার ডাকা শুরু করেছিল। দীর্ঘকাল কুষ্ঠ রোগ ছিল, এতে ক্ষতস্থানে গরম ছ্যাকা দিতে হতো। দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর যাবত এই রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তার ছ্যাকা দেওয়ার কারণে ফেরেশতারা আর তার সাথে সাক্ষাত করত না। পরবর্তীতে, তিনি ছ্যাঁকা দেয়া বন্ধ করলে ফেরেশতারা আবার মুসাফাহা শুরু করেন।
এভাবেই তাকে নাম দেওয়া, তিনি ফেরেশতাদের সদৃশ ছিলেন। আরবিতে বলা হয়, شبيه الملائكة
...

ডানাওয়ালা: জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ডানাওয়ালা বলা হত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচাতো ভাই। তিনি আবু তালিবের সন্তান। তাকে নাম দেয়া হয়েছিল, جعفر الطيار বা ডানাওয়ালা জাফর। এই নামটি দেয়ার কারণ হলো, মু'তার যুদ্ধে তিনি একাই এমনভাবে যুদ্ধ করলেন যে, যুদ্ধ করতে করতে তার একটি হাত কাটা পড়ে। অতঃপর অপর হাতে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করলে সেই হাতটিও কাটা পড়ে। এমতাবস্থায় তিনি শহীদ হন। পরবর্তীতে যখন তার সংবাদ মদিনায় আসে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি দেখেছি সে জান্নাতের ডানা ঝাপটিয়ে উড়ছে"। তাকে ذو الجناحين ও বলা হয়। طيار অনুসারে উড়ন্ত জাফর এবং جناحين অনুসারে ডানাওয়ালা জাফর। উক্ত ঘটনার সময় তার বয়স ছিল ৩৩ বছর। তার দুটি হাত কাটা পড়ার কারণে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বিনিময়ে দুটি ডানা দিয়ে দেন।

আরেকটি নাম ছিল, আবুল মাসাকিন বা মিসকিনদের পিতা। তিনি মিসকিনদের খুব বেশি দান-সাদকা করতেন।

ফারুক: ফারুক নামটি ছিল ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর। যিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন সর্বপ্রথম ইসলাম ও বাতিল সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে যায়। কারণ এর পূর্বেকার সময়ে মুসলমানরা ইবাদত করত চুপিসারে। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তিনি ঘোষণা দেন, প্রকাশ্যেই নামাজ আদায় করা হবে। অতঃপর তিনি কাবার প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করেন।
এজন্য তার নাম হয়ে যায় ফারুক; যিনি সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।

সিদ্দিক: সিদ্দিকে আকবর হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। সিদ্দিক মানে হচ্ছে অধিক সত্যায়নকারী। এই নামটি তাকে দেয়া হয় ইসরা এবং মিরাজের ঘটনার পরে। ইসরা এবং মিরাজের পরে যখন কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে ধরে নানান প্রশ্নে জর্জরিত করে তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করেছিল। তখন, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে মানুষগুলোকে দূরে সরানোর জন্য, বিমুখ করানোর জন্য কুরাইশরা বিভিন্ন ফন্দি আটে। এর প্রেক্ষিতে, আবু জাহেল নিজেই এসে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে বলল, তুমি কি শুনতে পেয়েছো তোমার বন্ধু কি বলছে,

সে নাকি বায়তুল মাকদিস থেকে ঘুরে এসেছে? এ কথা তুমি বিশ্বাস করো? তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কৌশলে বললেন, "তিনি যদি তা বলে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তা ঘটেছে। এবং সেটা আমি বিশ্বাস করি।"
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সরাসরি বলে দেননি যে, আমি বিশ্বাস করি। অর্থাৎ আবু জাহেলের একথা বানিয়ে বলতে পড়ার সম্ভাবনা আছে, বিধায় তিনি তা বলেননি।
তাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যদি তিনি তা বলে থাকেন, তাহলে তিনি সত্যই বলেছেন এবং আমি তা বিশ্বাস করি।

তখন থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নাম হয়ে যায় সিদ্দিক।
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আরেকটি নাম ছিল," আতিক" অর্থাৎ যিনি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত।

ঘোড়সওয়ার নেতা: আবু মুসা আল-আশয়ারি রা: এর উপাধি ছিল ঘোড়সওয়ার নেতা। তিনি ঘোড়ায় চড়ে এমন ভাবে যুদ্ধ করতে পারতেন যে, যতবড়ই বাহন হোক তা তার ঘোড়ায় তুলতে পারতেন। রাস্তা যতই সরু হোক বা যেকোনো ধরনের পরিস্থিতিতে, তিনি ঘোড়া দিয়ে অতিক্রম করতে পারতেন। এ কারণে তার নাম ছিল ঘোড়সওয়ার নেতা।

দাউদ বংশের বাঁশি: আবু মুসা আল-আশয়ারি রা: এর আরেকটি নাম ছিল, مزمار آل داوود বা দাউদ বংশের বাঁশি। নবীদের মধ্যে সবচেয়ে সুমধুর কন্ঠের অধিকারী ছিলেন দাউদ আলাইহিস সালাম। দাউদ আলাইহিস সালাম তেলাওয়াত করলে তখন মাছ(নদীর পারে) ও পাখিরা তার কাছে চলে আসত, আল্লাহর তাসবির শোনার জন্য। তদ্রূপ আবু মুসা আল-আশয়ারি রা: এর তেলাওয়াতও চমৎকার ছিল।
এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে,
দাঊদ ইবনু রুশায়দ (রহঃ) ... আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি যদি আমাকে দেখতে, গত রাতে যখন আমি তোমার কিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম (তখন আমার মনে হয়েছিল যে,) তোমাকে দাঊদ (আলাইহিস সালাম) এর বাশরীসমূহের (সুরমালার) একটি বাশরী (সুর) দান করা হয়েছে।
সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১৭২৫

অন্য হাদীসে আছে,
আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা ও ইবনু নুমায়র (রহঃ) ... বুবায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনু কায়স কিংবা তিনি বলেছিলেন, (আবূ মূসা) আল-আশ'আরীকে দাঊদ (আলাইহিস সালাম) পরিবারের বাশরী সমুহের একটি বাশরী (অর্থাৎ সুমধুর সুর) দান করা হয়েছে। *সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১৭২৪*

এভাবেই তার নাম হয়েছে দাউদ বংশের বাঁশি বা مزمار آل داوود ...

দুই চট ওয়ালা: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দে নাহম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নাম ছিল "দুই চট ওয়ালা।" তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন তিনি তার চাচাকে বিষয়টি জানালেন। এতে তার চাচা তার সমস্ত সম্পত্তির দখল করে নেন এবং তার গায়ের লুঙ্গি ও কাপড় পর্যন্ত খুলে নেন। অতঃপর বলেন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তবে তোমার শরীরের কাপড় পর্যন্ত আমি রাখবো না। এমতাবস্থায় তিনি তার মায়ের কাছে গিয়ে বলেন, আমাকে অন্তত শরীর ঢাকার জন্য কিছু দিন। তখন তার মা তাকে একটি চটের বস্তা দেন এবং তিনি তা দুটি ভাগে ভাগ করে নেন। দুই খণ্ডের একখণ্ড গায়ে পরেন এবং অন্য খন্ড নিচে পরেন।
এত ধনী একজন মানুষ ছিলেন কিন্তু পরিস্থিতির কারণে শেষমেশ দুটি চট পরে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন। এবং মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই তার নাম হয়ে যায়, দুই চট ওয়ালা।

ছোট বিড়ালের বাবা: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর আসল নাম ছিল আব্দুর রহমান ইবনে সাখর। অত্যন্ত বেশি বিড়াল পছন্দ করার কারণে তার নাম হয়ে যায় আবু হুরায়রা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর আলখাল্লার ফাঁকে, তার হাতের আস্তিন দিয়ে একটি ছোট বিড়ালের বাচ্চা বের হতে দেখলেন এবং মজা করে বলেন, তুমি তো ছোট বিড়ালের পিতা। তখন থেকে তার নাম আবু হুরায়রা হিসেবে পরিচিতি পায়।

উম্মতের বিশ্বস্ত: আবু উবাইদা আমর ইবনে আবদিল্লাহ ইবনুল জাররাহ হচ্ছেন এই পুরো উম্মতের জামিনদার বা উম্মতের বিশ্বস্তব্যক্তি। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন এর মধ্যে

একজন। বদরের যুদ্ধে তার অনন্য কাজটির জন্য তাকে পুরো উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বদরের যুদ্ধে তিনি তার পিতার মুখোমুখি হলে, তখন কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে দুর্বল করতে পারেনি। তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিজের পিতাকে হত্যা করেন এবং বলেন, দেখুন হে পিতা আপনি নিজেই কিন্তু নিজের হত্যার জন্য দায়ী। উক্ত ঘটনা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে, রাসূল ﷺ বললেন, "আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ হচ্ছে এই উম্মতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি।"

এছাড়া অন্যান্য আরো ঘটনার কারণে তিনি পুরো উম্মতের জামিনদার হিসেবে সাব্যস্ত হন।

সত্য অন্বেষণকারী সাহাবী: সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ভীষণ কষ্ট করে তার জীবনে অতিবাহিত করেছিলেন সত্যকেআলিঙ্গন করার জন্য। সত্যের খোঁজে একের পর এক সফর করেছেন। তাই তার নাম হয়েছে, الباحث عن الحقيقة বা সত্য অন্বেষণকারী সাহাবী।

যার কথা বিফলে যায় না: একজন সাহাবী ছিলেন বাররাহ ইবনে মালিক নামে। তিনি খুবই রহস্যময় একজন সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিছু বান্দা আছে। যারা যদি কখনো আল্লাহর জন্য কসম করে ফেলে, আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলা তার কথা অবশ্যই রাখেন। এই মানুষ গুলো দেখতে খুবই দুর্বল মনে হলেও, এদের কাছে মাত্র দুটো খেজুর যদি নাও থাকে। এ যদি একবার আল্লাহর কসম করে কোন কথা বলে ফেলে, আল্লাহ তাআলা সে কথাটি অবশ্যই অবশ্যই রাখেন।"
সেরকম একজন সাহাবী ছিলেন বাররাহ ইবনে মালিক। তিনি কোন বিষয় কখনো কসম করে ফেললে, সে বিষয়টি অবশ্যই আল্লাহর ঘটাতেন।
এমনকি তার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "তোমরা এই বাররাহকে কখনোই মুসলিমের বিরুদ্ধে কখনো কোন সৈন্যবাহিনীতে ব্যবহার করো না।"
অর্থাৎ খেলাফত এবং পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের মধ্যে নানা ধরনের মতনৈক্য সৃষ্টি হয় তখন সে উদ্দেশ্যে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

প্রথম প্রতিনিধি: মুসআব ইবনে উমাইর ছিলেন ইসলামের প্রথম প্রতিনিধি। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম মদিনায় পাঠান আল্লাহর দ্বীন প্রচার করা, মানুষদেরকে কুরআন ও কালেমার শিক্ষা দেয়ার জন্য। এ কারণে তিনি সর্বপ্রথম প্রতিনিধি হিসেবে সাব্যস্ত হন।
তিনি খুবই সমৃদ্ধশালি পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি এতটাই ধনী ছিলেন যে, তিনি কোন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে, তার ব্যবহৃত পারফিউমের/সুগন্ধির কারনে সে রাস্তাটি খুশবু হয়ে যেত। তখন মানুষ আন্দাজ করতে পারতো, এই রাস্তা দিয়ে মুসআব ইবনে উমাইর গিয়েছে।
তিনি তৎকালীন সময়ের যুবকদের মধ্যে এক ধরনের সেলিব্রিটি ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে যায়। তার পরিবার তাকে ত্যাগ করে। অতঃপর তাকে রাসুলুল্লাহ সাঃ মদীনায় প্রতিনিধি করে পাঠান। তিনিই প্রথম ইসলামে জুমুয়ার নামাজ পড়িয়ে ছিলেন।

মুহাজিরদের ঈমাম: ইমামুল মুহাজিরীন অর্থাৎ মুহাজিরদের ইমাম হিসেবে পরিচিত ছিলেন সালিম মাওলা আবি হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

রহস্যের বাহক: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেকগুলো গোপন তথ্য ছিল। তিনি সেগুলো গচ্ছিত রাখতেন সাহাবী হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা: এর কাছে। মদিনার মধ্যে কে কে মুনাফিক, সেই তালিকা তার কাছে ছিল। এবং আগামীতে কখন কোন যুদ্ধ এবং অভিযান প্রেরণ করা হবে, কোথায় কোন কাজ চলছে, গুপ্তচর হিসেবে কাকে কোথায় পাঠানো হয়েছে, মক্কায় কাফেরদের মধ্যে ছদ্মবেশে কোন কোন মুসলমানরা বসবাস করছে, এসকল গোপন তথ্যগুলো হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছে থাকতো। এজন্য তাকে বলা হয়, صاحب سر رسول ... যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোপন তথ্যের বাহক ছিলেন।

উম্মতের ইউসুফ আ: জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উম্মতের ইউসুফ আ: হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তুমি দেখতে খুবই সুদর্শন ও সম্ভ্রান্ত চেহারার মানুষ ছিলেন, এ কারণে তাকে উম্মতের ইউসুফ বলে নামকরণ করা হয়েছে।

আল্লাহর সিংহ: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় চাচা হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসাদুল্লাহ তথা আল্লাহর সিংহ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার বীরত্বের কারণে এই নামটি দেয়া হয়েছিল।
এছাড়া তার আরেকটি নাম ছিল, "সাইয়েদুশ শুহাদা" বা শহীদদের নেতা। তাকে উহুদের ময়দানে শহীদ করা হয় যা ছিল খুবই হৃদয়বিদারক ঘটনা। এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই কষ্ট পান এবং তিনি ﷺ পরবর্তীতে সেই হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে চাননি (পরবর্তীতে তিনি ক্ষমা করেন)।

সাইফুল্লাহ: খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নাম ছিল সাইফুল্লাহ কথা আল্লাহর উন্মুক্ত তরবারী। এই নামটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিয়েছিলেন।

দুই সাক্ষীর মালিক: খুযাইমা ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দুই সাক্ষী মালিক ছিলেন তথা তার একার সাক্ষ্য দুজনের সাক্ষের সমান ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একার সাক্ষ্য দুজনের সাক্ষের সমান বলে ঘোষণা করেছিলেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি ঘোড়া কিনেছিলেন একজনের কাছ থেকে। পরবর্তীতে সেই বিক্রেতা অস্বীকার জানালো যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘোড়া বিক্রি করেননি। সে অপবাদ দিয়ে বসলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে ঘোড়াটি না বলে এনেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। তখনই খুযাইমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাক্ষ্য দিলেন এই বলে যে, উক্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঘোড়াটি বিক্রি করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে খুযাইমা! তুমি এভাবে সাক্ষী কেমনে দিতে পারলে? তুমি তো আমাদের সাথে সেই জায়গায় ছিলে না।" তখন তিনি বললেন, "আপনি যেই রিসালাত, যেই তাওহীদ, যেই জান্নাত, জাহান্নাম, আখিরাত, কবর এসকল বিষয় নিয়ে আপনি এসেছেন, সে সব কিছু না দেখি আমি সাক্ষ্য দিয়েছি আপনি কথা সত্য বলেছেন। তাহলে, সামান্য একটি ঘোড়ার ব্যাপারে আপনি কিভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারেন!(অর্থাৎ আপনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন না)। সেটা আমার দেখার কোন প্রয়োজন নেই। না দেখেই আমি এব্যাপারে সাক্ষী

দিতে পারি।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এ খুযাইমা, একজন ব্যক্তির সাক্ষী, দুইজনের সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ হবে।”

ভালোবাসার সন্তান ভালোবাসা: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পালক পুত্র যায়েদ ইবনে সাবিত এবং যায়েদের সন্তান উসামা রা: কে বলা হত, “ভালোবাসার সন্তান ভালোবাসা।”

উম্মতের পন্ডিত: এই উম্মতের পন্ডিত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস কে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে দোয়া করেছিলেন, তাকে যেন আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানের অধিকারী করেন। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি দোয়া করেছিলেন, তাকে যেন আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা কুরআনের তাফসীরের জ্ঞান দান করেন। তাই তার আরেকটি নাম হয়েছে, তরজুমানুল কোরআন তথা কুরআনের মুখপাত্র।

হারামাইনের পানি সিঞ্চনকারি: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলা হত হারামাইনের পানি সিঞ্চনকারি। তাকে এই নামটি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দিয়েছিলেন। একবার মক্কা-মদিনায় অত্যন্ত খরার কারণে বৃষ্টির অভাব দেখা দিলো। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! যখন আপনার রসূল আমাদের মাঝে ছিল, তখন আমরা বৃষ্টির দোয়া করলে বৃষ্টি পেয়ে যেতাম। এখন আমাদের মাঝে তো রসূল নেই, তবে তার চাচা আছেন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। অন্তত তার দিকে চেয়ে হলেও আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।” তখন আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বৃষ্টি নাযিল করেন। এবং এর ফলে, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নাম হয়ে যায়, ساقي الحرمين বা দুই হারামের পানি সিঞ্চনকারি।

মসজিদের পায়রা: আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে “মসজিদের পায়রা” ডাকা হতো।

রসূলুল্লাহর বক্তা: রসূলুল্লাহর বক্তা হিসেবে নাম ছিল সাবিত ইবনে কাইস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর।

আল্লাহর ব্যবসায়ী: আল্লাহর ব্যবসায়ী নাম ছিল আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এর। কারণ, তিনি তাঁর সকল সম্পদ মক্কায় রেখে, মদিনায় হামাগুড়ি দিয়ে এসেছিলেন। কোন কাপড় চোপড় ছাড়াই।

উত্তমের উত্তম: আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু الطيب المطيب তথা উত্তমের উত্তম হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ইসলামের বলিষ্ঠ কন্ঠ: ইসলামের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত ছিলেন আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি কূটনৈতিক কলাকৌশলে বেশ পারদর্শী ছিলেন।

কাতিবুল ওহী: মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং যায়েদ বিন সাবিত, তাদের নাম ছিল কাতিবুল ওহী তথা ওহীর লেখক।

সাহাবীয়াদের কিছু নাম হল:

উম্মাহাতুল মু'মিনীন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদেরকে বলা হত উম্মাহাতুল মু'মিনীন বা মুমিনদের মা।

নারী বক্তা: আসমা বিনতে ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বলা হত خطيبة النساء ... তিনি বলিষ্ঠ কন্ঠের নারী ছিলেন। তিনি নারীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিভিন্ন হাদিস হতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বয়ান করতেন। তাই তাকে এই নামটি দেয়া হয়।

দুই ফিতার অধিকারিণী: আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ذات النطاقين বা "দুই ফিতার অধিকারিণী" হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যেই রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হিজরত করেন, আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাদের খাবার প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। খাবারের থলির মুখ বন্ধ করার জন্য কোন রশি না পাওয়া গেলে, তিনি তার পাজামার ফিতাকে দুই খণ্ড করে একখণ্ড দিয়ে সেই খাবারের থলে বাঁধেন এবং বাকি খন্ড তিনি পাজামায় ব্যবহার করেন। এজন্য তার নাম হয় ذات النطاقين বা দুই ফিতার অধিকারিণী।

ত্বহেরা: উম্মুল মুমিনীন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নাম ছিল ত্বহেরা।

কোরআনের রক্ষক: আরেকজন সাহাবী পরিচিত ছিলেন حارسة القرآن নামে,
তথা কোরআনের রক্ষক বা রক্ষিকা। তিনি হলেন উম্মুল মুমিনীন হাফসা বিনতে ওমর।
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুরআনকে একত্রিত করেন। তখন সেই একত্রিত খণ্ডটি হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছে গচ্ছিত রাখা হয়। তিনি সেটিকে রক্ষা করেন। তাই তাকে বলা হয় حارسة القرآن বা কুরআনের রক্ষিকা।

যাহরা: নবীজির আদরের কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নাম ছিল যাহরা; ফাতিমাতুয যাহরা।

হুমায়রা: উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হুমায়রা নামে পরিচিত ছিলেন।

স্বপ্নের অধিকারিণী: এক সাহাবী স্বপ্নের অধিকারিণী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু হতেন। তার নাম ছিল আতিকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। তিনি বদর যুদ্ধের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই স্বপ্ন দেখেছিলেন, বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়ে কুরাইশদের ঘরগুলো তছনছ করে দিচ্ছে। এরকম অনেক স্বপ্ন দেখার পর তিনি বুঝেছিলেন

যে, বড় কোন বিপদ হয়ত ঘনিয়ে আসছে। তোমরা কখনোই আমার ভাইপো মোহাম্মদ (ﷺ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেও না। এ কারণে তার নাম হয় স্বপ্নের অধিকারিণী।

রাসূল এর মেজবান: উম্মে মা'বাদ বিনতে খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রায়ই অতিথি হিসেবে গ্রহণ করতেন। তিনি হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বকরীর দুধ পান করেছিলেন।

الحور: উম্মে রুমান বিনতে আমির তার সৌন্দর্যের জন্য حور নামে পরিচিত ছিল।

দুই হিজরতের অধিকারিণী: আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা "দুই হিজরতের অধিকারিণী" হিসেবে পরিচিত ছিল।

রসূলুল্লাহর প্রতিনিধি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন মেয়েদের মজলিসে যেতেন। তিনি হলেন, জুমিয়া বিনতে আশরাস।

রসূলুল্লাহর নার্স: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথম নার্স ছিলেন রুফাইদা বিনতে কা'ব।

আতরওয়ালী: আসমা বিনতে মাখরবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আতরওয়ালী হিসেবে পরিচিত ছিল।

ওড়নাওয়ালী: হিন্দাহ বিনতে সোআ' নামে একজন সাহাবীয়া ছিলেন। তিনি হয়তো খুব বেশি ওড়না ব্যবহারের কারণে ওড়নাওয়ালী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

প্রথম হিজরতকারিণী: লায়লা বিনতে আবি হাসমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন প্রথম হিজরতকারিণী সাহাবীয়া।

শুরার ঘরের অধিকারিণী: ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে নিয়ে শুরা বা পরামর্শ করতেন। তার নাম হয়েছে শুরার ঘরের অধিকারিণী।

শহীদের মা: আফরা বিনতে উবাইদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নাম ছিল أم الشهداء বা শহীদদের মা।

প্রথম শহীদা: সুমাইয়া বিনতে খাব্বাত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা ছিলেন প্রথম শহীদা।

কোরআনী নারী: المرأة القرأنية নাম ছিল যয়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার।

সমুদ্রের শহীদ: একজন সাহাবীয়া ছিলেন যিনি সমুদ্রের শহীদ। তিনি সমুদ্রের শহীদ হয়েছিলেন। তার নাম, উম্মে হারম।

দুই হিজরতওয়ালী: দুই হিজরতওয়ালী অনেকেই ছিলেন কিন্তু তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন রুকাইয়া বিনতে রসুলুল্লাহ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা। তিনি দুবার হিজরত করেছিলেন; একবার আবিসিনিয়ায় এবং আরেকবার মদিনায়।

নবীর চাদরের অধিকারিণী: এক সাহাবীয়ার কাছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামা বা চাদর ছিল। তাই তার নাম হয়েছিল, ذات القميص النبوي ... তিনি হচ্ছেন, ফাতেমা বিনতে আসাদ।

সাহাবীদের তুলনায় নারী সাহাবীদের নাম ও উপাধিগুলো বেশি ছিল। তারা সমাজ গঠনের জন্য এমন ভাবে কাজ করতেন যাতে কেউ না জানে; গোপনে। দান সদকা, বড় বড় সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি সমর্থন বা নিজেদের মত জানানো, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মে নিজেদের বুদ্ধি, আইডিয়া দেয়া সহ

বিভিন্ন কাজ তারা গোপনে করতেন বিধায় মানুষ তা জানতে পারত না। কিন্তু, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতেন। তাই স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের বিভিন্ন নাম ও উপাধিগুলো দিতেন। যেন, অন্তত স্বীকৃতির মাধ্যমে তারা পরিচিতি পান। তাদের নাম অন্যান্যরা জানতো না কিন্তু তাদের উপাধি ও স্বীকৃতি গুলো সবাই জানতো। এতে করে,তাদের রিয়া হতো না এবং তাদের নামও মানুষ জানত না বরং তাদের স্বীকৃতি ও অবদানগুলো গুলো সবাই জেনে যেত।

আল্লাহু সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা এই উম্মতের মধ্যে সুন্দর সুন্দর কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। তন্মধ্যে, একটি হলো আমরা একে অপরকে সুন্দর নাম দিই এবং তাতে উদ্বুদ্ধ হই। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কারো মন ভালো করার জন্য সুন্দর নাম দিতেন, যা শুনলেই হাসি পেয়ে যেত। একবার ফাতেমা রা: এর সাথে আলী রা: এর মনোমালিন্যের কারণে, আলী রা: ঘর ছেড়ে মসজিদে গিয়ে শুয়ে রইলেন। তখনকার সময়ে মসজিদে নববীর ফ্লোর ছিল মাটির তৈরি। মাটিতে শুয়ে থাকার কারণে তার গায়ে মাটি লাগতো। এটা দেখে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী রা: কে “হে মাটিওয়ালা!” বা أبو تراب বলে সম্বোধন করলেন। এটা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মন ভালো করার চেষ্টা করতেন।

উপাধি ব্যবহারের বিধান

উপাধি দেওয়ার নিয়ম: উপাদী দেয়ার ক্ষেত্রে তিন ধরনের নিয়ম রয়েছে। হাফেজ আলানি নামক একজন আলেম এ বিষয়ে বলেছেন,
নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা তিন ধরনের হুকুম পাই।

1. জায়েজ: এমন নাম যা কোন খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। এনামে কারো কোনো কমতি থাকে না। বরং এসব নাম সেই ব্যক্তিকে আরো সম্মানিত ও খুশি করে। এটা জায়েজ। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে ذو اليدين বা “দুই হাত ওয়ালা” বলে ডাকতেন। সাধারণত মানুষের দুই হাতই থাকে, কিন্তু তবুও তাকে দুই হাত ওয়ালা ডাকতেন, কারণ তিনি খুব পরিশ্রমী ছিলেন।

2. নাজায়েজ: যেসকল নাম কাউকে নিন্দার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়। কাউকে কোনো শারীরিক কমতির কারণে নিন্দার উদ্দেশ্যে নাম দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। যেমন অনেকে বলে থাকে বাইট্টা মজিদ, লম্বু সেলিম, নাকবোচা শহীদ, কপালপোড়া সবুজ, কানকাটা রমজান (নাউজুবিল্লাহ); এসকল নাম সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম।
3. ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত: অর্থাৎ, যাকে নামটা দেয়া হয় সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। এটা শারীরিক কোনো বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নাম হতে পারে। যদি সেই নামটি খুব বেশি প্রচারিত হয়ে যায় অথবা ব্যক্তি নিজেই তা প্রচার করে বেড়ায় কিংবা অন্যরা প্রচার করলেও তিনি তাতে নাখোশ না হয়ে খুশিই থাকেন, এক্ষেত্রে সেই নাম ব্যবহার করা জায়েজ আছে।

সতর্কবার্তা: এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা সূরা হুজুরাতের ১১ নম্বর আয়াতে সতর্ক করে বলেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

“হে মু’মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন মহিলা অপর কোন মহিলাকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করনা এবং **তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকনা; ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ**। যারা এ ধরণের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম।”

আমাদের উচিত, কাউকে মন্দ নামে না ডেকে বরং তার মন্দ নাম থাকলে সেটা দূরীভূত করার চেষ্টা করা; মন্দ নামের পরিবর্তে তার জন্য সুন্দর নাম প্রচলন করার মাধ্যমে। আমরা আমাদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য সুন্দর নামগুলোকে বাছাই করে, সেই সুন্দর নাম অনুযায়ী নামে ডাকবো। প্রতিদিন আমরা ছোটদেরকেও সুন্দর সুন্দর সুন্দর নামে ডাকতে পারি।

এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি সুন্নাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এর সমাজে প্রচলন করেছিলেন। এই সুন্নতের অনেক সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। এই নামগুলো মানসিকভাবে মানুষকে শক্তিশালী ও উৎসাহিত করে।

মানুষ পছন্দ করে তাকে প্রিয় কোন নাম দিয়ে মানুষ ডাকুক। এজন্য, কাউকে তার প্রিয় নামটি দিয়ে ডাকা সবথেকে উত্তম। কেননা, মানুষ অনেক সময় খারাপ উদ্দেশ্যে অন্যকে নাম দেয়। তাই আমাদের উচিত, কাউকে কখনো কোন নাম দিলে সে নামটা যেন তার প্রিয় অথবা সুন্দর নাম হয়, কাউকে খারাপ নাম দিয়ে তাকে কষ্ট না দেয়া।